Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 52 – 58
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

পজিটিভিজমের আলোকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'

পূজা ভুঁঞে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : pujabhuinya@rediffmail.com

Keyword
পজিটিভিজম, অলৌকিক, কু-সংস্কার, ভূত, আত্মা, বিজ্ঞান, দৈব, ওঝা, পরহিতব্রত।

Abstract
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর রচিত একাধিক ছোটগল্পের মধ্যে একটি জনপ্রিয় ছোটগল্প 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'। যাকে কেন্দ্র করে ২০০৭ সালে চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছে। গল্পটির মূল প্রেক্ষাপট ক্ষুধা ও বাঁচার আকুতি হলেও আরও একটি বিষয় গল্পে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আর তা হল গ্রামীণ সমাজের অলৌকিক বিশ্বাস ও কু-সংস্কার। আর এই বিষয়টিকে আমরা কোঁতের পজিটিভিজম থিওরি দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারি। অগাস্ট কোঁত পজিটিভিজম তত্ত্বের জনক। শিল্পায়নের শুরু থেকেই সমাজ গঠনের কাঠামোতে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগতে শুরু করে। আর তার ফলে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, কোনো দৈব বা অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা নয়, বরং প্রকৃতির সবকিছুই নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। সুতরাং কোনো কিছুকেই রহস্য না ভেবে, পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ দ্বারা তার পিছনের প্রকৃত কারণ উদঘাটন করা সম্ভব। আর এই বিশ্বাসকেই বলা হয় পজিটিভিজম বা দৃষ্টবাদ বা প্রত্যক্ষবাদ বা প্রামাণিকবাদ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' তে এই তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায়। এবং গল্পের এক পর্যায়ে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো সুরেন্দ্রর তৎপরতায় বিজ্ঞানের জয় হয়েছে। গল্পের শুরু হয়েছে একদল জোয়ান ছেলেদের ভূত কেনার গানের মধ্য দিয়ে। এদের নেতা সুরেন্দ্র। সে শহরে থাকে, সেখানেই কাজকর্ম করে। শনি ও রবিবার সে গ্রামে আসে। ভূত কেনা তার চালানি ব্যবসা। সে একশো টাকায় ভূত কিনে আড়াই শো টাকায় শহরের এক বাবুর কাছে বিক্রি করবে বলে জানায়। কিন্তু এর পুরোটাই বাহ্যিক বিষয়। এর আড়ালে লুকিয়ে আছে সুরেন্দ্রর এক বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্র আসলে চেয়েছিল গ্রামের মানুষের মন থেকে কু-সংস্কার দূরীকরণ করতে। সে ফাদার পেরেরার কাছে প্রাথমিক ডাক্তারি চিকিৎসা বিদ্যা শিখেছে। গ্রামের মানুষের বেশিরভাগ অসুখই চাপা পড়ে যায় অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসে। সুরেন্দ্রর গ্রামের মানুষের ভূত বা আত্মাকে কেন্দ্র করে একাধিক বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। সুরেন্দ্র গ্রামে এসে প্রথম দিকে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে, আত্মা বলে কিছু নেই। কিন্তু গ্রামের মানুষ তা বিশ্বাস করতে নরাজ। তাই সে ভূতের সন্ধানে ছিল, বলা ভালো ভূতে ধরার আড়ালে এইরকম রুগীর সন্ধানে, যাদের সে সেবা করতে পারবে। যারা দৈব বিশ্বাসের ফলে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। আজও গ্রামীণ এলাকায় মানুষ

ডাক্তারের থেকে ওঝাকে বেশি বিশ্বাস করে। এই সকল বিষয়গুলিকে সামনে রেখে আমরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' বিশ্লেষণ করতে পারি।

Discussion

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্প 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'। গল্পটি শুরু হয় অমাবস্যার রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকারে একদল প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের ভূত কিনতে বেরোনোর মধ্য দিয়ে। কিন্তু গল্পের সমাপ্তি ঘটে গরম ভাত খাওয়ার আশায় থাকা বৃদ্ধ পবনের অমানবিক মৃত্যু দিয়ে। গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে 'গরমভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প'। অর্থাৎ আমরা গল্পটিকে গরম ভাতের গল্প হিসেবেও নিতে পারি অথবা ভূতের গল্প হিসেবেও দেখতে পারি। তবে আমার মনে হয়, গল্পটি আসলেই ভাত আর ভূতের সংমিশ্রণ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্পের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট উপকাহিনির সংমিশ্রণ ঘটেছে। যেমন- সুরেন্দ্রর কাহিনি, নিবারণের কাহিনি কিংবা শান্তির কাহিনি। এরা প্রত্যেকেই বাঁচার জন্য লড়াই করে চলেছে। প্রত্যকের জীবনই চরম ট্র্যাজিক। সুরেন্দ্র ছোটবেলায় জমিদার বাড়ির মেজোবাবুর হাতে মার খেয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। পরে বাবা-মা' দু'জন কেই হারায়। বড় হয়ে যখন সে গ্রামে ফিরে আসে তখন সে জমিদার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। গ্রামের দূর্গাপূজা বরাবর জমিদার বাড়িতে হয়ে এসেছে। অথচ জমিদার বাড়ি থেকে কোনো প্রকার খরচ দেওয়া হয় না। পূজো হয় গ্রামের মানুষের চাঁদাতেই। সুরেন্দ্র এর প্রতিবাদ করে জানায়—

> "গাঁয়ের লোকের পয়সাতেই যদি পূজো হয়, তো সে পূজো হবে গাঁয়ের মাঝখানে চালা বেঁধে।"[১]

অন্যদিকে নিবারণ তার বৃদ্ধ বাবা, দুই সন্তান আর স্ত্রীর লালন-পালন করতে নাজেহাল অবস্থা। গর্ভবতী স্ত্রীকে পেট ভরে ভাত খেতে দিতে পারে না, কারণ নিবারণের হাতে কাজ নেই। প্রকৃতিও তার প্রতি নির্দয়। মাত্র পাঁচ দিন আগে লাগানো ফুলকপির চারা বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায়। লেখকের ভাষায়—

> "এই সময় এত বৃষ্টির কথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। এ যেন ঈশ্বরের অভিশাপ। আজ আবার পাশের জমির আল ভেঙে গিয়ে জল ঢুকে পড়লো।"[২]

গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই নিবারণ তার বাবা পবনকে হত্যা করে। যাতে সে মরে গিয়ে ভূত হয়ে ধরা দেয়, আর তাদের মুখে অন্ন ওঠে। আবার শান্তির কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, গ্রামের লোকে জানে সে অত্যন্ত লাজুক একটি মেয়ে। সর্বানন্দের ছেলে বিভূতির সাথে তার বিবাহ হয়। ইতিমধ্যে সে সন্তানসম্ভবা। কিন্তু সে হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত। গ্রামীণ ভাষায় যাকে বলে মৃগী রোগ। ডাক্তারি শাস্ত্রে, হিস্টিরিয়া হল একপ্রকার মানসিক রোগ, যা নিউরো হরমোন ও মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার সাংসারিক জীবন খুব একটা সুখকর নয়। সুরেন্দ্র সর্বানন্দকে উদ্দেশ্য করে বলে—

> "একটু আগে তোমার ছেলের বউ আমার কানে কানে কী বলেছে জানো? যদি সবার সামনে বলে দেই, তোমার মুখে চুনকালি পড়বে।"[৩]

- বলাবাহুল্য এই বক্তব্যে উঠে আসে সর্বানন্দ ও তার পরিবারের কোনো অসামাজিক কার্যকলাপের ঈঙ্গিত।

গ্রামের মানুষের মধ্যে ভূত-প্রেত নিয়ে একাধিক বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়। নিবারণের পিতা পবন জানায়, এখনও পর্যন্ত সে পেত্নী, মেছো ভূত সহ মোট সতেরো রকমের ভূত নিজের চোখে দেখেছে। পবনের মনে আফসোসের সুর, যেখানে দশখানা তাগড়াই মানকুচুর দামও দশ টাকা ওঠে না সেখানে সুরেন্দ্র ভূত পিছু দশ টাকা দেবে। সেসময় এই দশ টাকায় দশ কেজি চাল কেনা যায়। পবন ও তার পরিবার অভুক্ত। অথচ ভূত তাদের প্রতি নির্দয়। একটা ভূতও তাদের চোখে পড়ে না! এই প্রসঙ্গে বিনোদ জানায়, তার মা একদা শাঁকচুন্নি দেখে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলো। আবার

নিতাইয়ের বাবাকে তাড়া করেছিল আলেয়া নামক ভূতে। ঘনাইয়ের মামা ভূত সংক্রান্ত বিষয়ে ভির্মি খেয়েছিল তিনবার। গ্রামের মানুষ পরকালে বিশ্বাসী। তারা কোনভাবেই মানতে রাজি নয় যে মানুষের আত্মা থাকতে পারে না।

> "সুরেন্দ্র নাকি প্রথম গাঁয়ে এসে নিতাইদের বলেছিল, মানুষের আত্মা বলে কিছু নেই। কথাটা শুনলেই গা ছমছম করে। মানুষের আত্মা নাই? তাহলে কোথা থেকে আসা আর কোথায় যাওয়া? এ-জন্মে দুঃখ কষ্ট সহ্য করলেও পরকালে সুখের আশা থাকে। আত্মাই যদি না থাকে, তাহলে আর পরকাল কী? হারামজাদা। এসব কথা যে বলে, মেরে তার মুখ ভেঙে দিতে হয়।"[৪]

শুধু ভূতেই নয়, গ্রামের মানুষ যখেও চরম বিশ্বাসী। যখ বা যক্ষ'কে ভূতেরই একপ্রকার প্রজাতি বলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সে ধনসম্পদের রক্ষাকর্তা। লোকসমাজে যখ দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। যখ দেওয়া হল একপ্রকার ভয়ানক ক্রিয়া-পদ্ধতি। যেখানে একটি জীবিত বালককে মাটির নীচে সঞ্চিত ধনরাশির সঙ্গে পুঁতে দেওয়া হয়। এই বালক যখ হয়ে ধনরাশি রক্ষা করে। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, গ্রামের মানুষের বিশ্বাস পূর্বপাড়ার দীঘিতে যখ আছে। ঐ দীঘিতে প্রতি বছরে একজন করে মানুষ টেনে নেয় যখে। তার সত্ত্বেও সুরেন্দ্রর দল যখন মজা দিঘীটা পরিষ্কার করতে নামে তখন তাদের দলের একজনকে মাঝপুকুরে টেনে নেয় যখে।

> "মাঝ পুকুরে ডুব দিয়ে মাটি তুলতে গিয়ে আর দম পায় নি। হাঁক-পাঁক করতে করতে যখন উঠলো তখন মুখখানা নীল হয়ে গেছে। তবু ওদের আক্কেল হয় নি, আবার সামনের হপ্তায় নামবে।"[৫]

অতঃপর আমরা দেখতে পাই, একদা সর্বানন্দের ছেলের বউ শান্তিকে ভূতে ধরেছে বলে সেই খবর সুরেন্দ্রর কাছে পৌঁছায়। অন্যদিকে গ্রামের প্রসিদ্ধ ওঝা মহাদেবের ছেলে সুবল ভূত তাড়ানোর নানান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে থাকে শান্তির ওপর। সুরেন্দ্রর মতে শান্তিকে ভূতে ধরেনি। প্রকৃতপক্ষে সে হিস্টিরিয়ার পেসেন্ট। শান্তির ভূতে ধরার কারণ হিসেবে সুবল জানায়—

> "আজ ভোরবেলা বাসি কাপড়ে এই বউটি ঘর থেকে বেরিয়েছে। তখনও ভালো করে সূর্য ওঠে নি। ঘর থেকে উঠোনে পা দিয়েই দেখলো, তিনটি কই মাছ। একটা বড় মাটির হাঁড়িতে কাল রাত থেকে কইমাছ জিয়োনো ছিল। এ বাড়িতে প্রায় এরকম জিওল মাছ রাখা থাকে। কোনোক্রমে হাঁড়িটা কাত হয়ে পড়ে- ছিল, তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা মাছ। বেড়ালে যে খেয়ে ফেলে নি, তাই ভাগ্যি। বেড়াল অবশ্য জ্যান্ত কই মাছ ভয় পায়। বউ তাড়াতাড়ি মাছ গুলোকে ধরে হাঁড়িতে ভরলো। সেই আঁশ হাত না ধুয়েই মুছে ফেলল কাপড়ে। তারপর ঘুম চোখে জল খালাস করে আবার ঘরে ফিরে শুতে যাবে, এমন সময়—"[৬]

এ সবই সুবলের কল্পনা। সে শান্তির কেস দেখে তার ওঝা বিদ্যার জোরে এই বৃত্তান্ত বলেছে। শুধু তাই নয়, তার ওঝা বিদ্যায় আরও দেখতে পেয়েছে—

> "ঐ জাম গাছটায় ওঁত পেতে বসেছিল দুটিতে, দুই দুষ্টু আত্মা, ওরা তো এইসব সুযোগই খোঁজে! বাসি কাপড়ে আঁশ হাত মুছেচে, তার ওপর পেচ্ছাপ করে এসে পায়ে জল দেয় নি, বউ যেই জামগাছতলা দিয়ে আসছে, অমনি গাছের একটা ডাল নিচু হয়ে নেমে এসে মারলো তার মাথায় একটা ঝাপটা। ব্যস, সেই যে পড়ে গেল উঠোনে, আর তাকে নাড়ানো যায় না।"[৭]

এর পরের দৃশ্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সুবল তার কথা প্রমাণ করতে শান্তিকে ঝাঁটা দিয়ে বাড়ি মারে, আর তার বলা কথা স্বীকার করায়।

> "হাতের ঝাঁটা দিয়ে শান্তিকে খুব জোর একটা বাড়ি মেরে বললো, হারামজাদী, ছোটলোকের নাঙি, বল বল, বউ বাসি কাপড়ে মাছ ধরে নি? শান্তির মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুলো, উঁ উঁ। ঐ দ্যাখো, স্বীকার পেয়েছে। আরও শুনবে?..."[৮]

ইতিমধ্যে সুবল গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে এই বার্তা যে, শান্তিকে যে ভূতে ধরেছে সেটি আসলে সর্বানন্দের বাড়ির উঠোনের জাম গাছে থাকা পেত্নী। শুধু তাই নয়, পেত্নীর মন্দা (ছেলে সঙ্গী) জাম গাছের ডালে এখনও

বসে আছে। তাই সুবল গাছের চারপাশে গন্ডি কেটে দেয়। সুবলের এই ভাওতাবাজিকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সুরেন্দ্র জাম গাছে উঠে প্রমাণ করে দেয়, সেখানে আদৌ কোনো মন্দা ভূত নেই। ফলত সুবলের চেষ্টা বিফলে যায়—

> "সবচেয়ে মোটা ডালটার ওপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, কোথায় সে? সুবল বলল, আরও ওপরে, একেবারে ডগায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, হাসছে ব্যাটা। আর একটু ওপরে ওঠো, টেরটি পাবে। সুরেন্দ্র বুঝল ওর চালাকিটা। জাম গাছের ডাল তেমন মজবুত নয়। তাদের বাড়িতে একটা জাম গাছের পিঁড়ি ছিল, কথা নেই বার্তা নেই একদিন এমনিই সেটা মাঝখান থেকে ফেটে দু-ভাগ হয়ে গেল। এখম সে তার এতবড় শরীরটা নিয়ে যদি আরও ওপরে ওঠে, তাহলে হঠাৎ ভেঙে পড়ে যাবে। আর না উঠলে ওরা বলবে, সে হেরে গেল! কোমরের বেল্টটা খুলে সে একটা গোল ফাঁস করলো। তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ডিঙি মেরে যতটা লম্বা হওয়া সম্ভব লম্বা হয়ে, সে বেল্টের ফাঁস দিয়ে ধরার চেষ্টা করলো ডগার ডালটা। একবার ধরতে পেরেই সে মট করে ডালটা ভেঙে সেটা হাতে নিয়ে নেমে এলো নীচে।"[৯]

সুরেন্দ্র গ্রামের মানুষের কাছে প্রমাণ করে দেয় সুবলের মিথ্যাচার। সে শান্তির প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা স্বরূপ ঘুমের ইনজেকশন দেয়। তার অবশ্য সুঁই (ইনজেকশন) দেওয়া অভ্যাস রয়েছে। ডাক্তার ফাদার পেরেরার কাছে সে সুঁই দেওয়া শিখেছে। শুধু তাই নয়, এই ফাদারই তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে নিজের বাড়িতে রেখে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে। সুরেন্দ্র তার কাছ থেকেই শিখেছে সৌজন্য, সভ্যতা, ভদ্রতা আর নিজের রাগকে বশে রাখার ক্ষমতা।

এই গল্পে একদিকে যেমন দেখানো হয়েছে অভুক্ত মানুষের হাহাকার। আবার আর এক দিকে গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে, গ্রামীণ মানুষের কু-সংস্কার। যাকে আমরা পজিটিভিজম তত্ত্বের আলোকে দেখতে পারি। গল্পের মূল অবধারক নিবারণের পরিবার হলেও, গল্পের প্রধান চরিত্র সুরেন্দ্র। সুরেন্দ্রর মধ্য দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করেছে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা-ভাবনা। প্রতি অমাবস্যার রাতে সুরেন্দ্র আর তার দলবল ভূত কিনতে বের হয়। সাথে গান ধরে—

> "ভূত কিনিতে এয়েছি ভাই ভূত কিনিতে এয়েছি/ ভূতের তেলে ওষুধ হবে স্বপ্ন আদেশ পেয়েছি।"[১০]

সুরেন্দ্রর ভূতের দর দশ টাকা থেকে ক্রমে তা একশো টাকায় পৌঁছায়। গ্রামের মানুষের কাছে এই বিষয়টি অত্যন্ত হাস্যকর এবং কৌতহলেরও বটে, তারা বাপের জন্মে এমন ব্যবসার কথা শোনেনি। সুরেন্দ্রর ভূত ধরার সরঞ্জাম হিসেবে তার কাছে থাকে একটা ছোট টিনের বাক্স, একটা টর্চ, এক বান্ডিল ব্যান্ডেজের কাপড় আর একটি খালি মোদের বোতল।

পজিটিভিজম হল সেই দার্শনিক তত্ত্ব, যা মনে করে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে চলেছে তার ব্যাখ্যা একমাত্র বিজ্ঞান দিতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুকে ইতিবাচক ভাবে মাপা ও বোঝা সম্ভব। এখানে মাপা বলতে বোঝানো হয়েছে, আমদের বুদ্ধি প্রত্যেকটি বিষয়কে পরিমাণগত(Quantity) ভাবে বুঝতে পারে।

> "Positivism is an empiricist philosophical theory that holds that all genuine knowledge is either true by definition or positive—meaning a posteriori facts derived by reason and logic from sensory experience. Other way of knowledge, such as theology, metaphysic, intuition, or introspection, are rejected or considered meaningless."[১১]

পজিটিভিজম (Positivism) শব্দটির বাংলা অর্থ বলা যেতে পারে প্রত্যক্ষবাদ বা প্রামাণিকবাদ। এই মতের উদ্ভাবক এবং প্রচারক বিখ্যাত ফরাশি দার্শনিক অগস্ত কোঁত(Auguste Comte)। যিনি ছিলেন রাজতন্ত্র এবং পুরোহিতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। আধুনিক কালে তাঁকে বিজ্ঞানের প্রথম দার্শনিক বলে গণ্য করা হয়। বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে কোঁত এর পজিটিভিজমের প্রথম ভাগ ও ১৮৪২ সালে শেষ ভাগ প্রকাশিত হয়। ছয়টি খণ্ডে প্রকাশিত এই বইটির নাম 'Philosophie Positive'। যেখানে তিনি পৃথিবীর সকল বিষয়কে যুক্তি দ্বারা বোঝানোর কথা বলেন। অর্থাৎ পজিটিভিজম তত্ত্ব অনুসারে, যুক্তি ও বিজ্ঞানের বাইরে কিছু নেই। কোঁত এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই' গ্রন্থের 'পজিটিভিজম' প্রবন্ধে স্বপন বসু বলেছেন—

> "যুক্তিবাদী দার্শনিকের কাছে স্বর্গ, আত্মা, অমরতা, অতীন্দ্রিয় লোক এসবের কোনো অস্তিত্ব নেই। চারপাশে যা ঘটছে তার বাইরে আমরা আর কোনো কিছুই জানি না। পর্যবেক্ষণ (Observation) পরীক্ষা (Experiment)

ও উপমা (Comparison) এই তিন পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জগৎকে দেখি এবং বুঝি, বিভিন্ন ঘটনা এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক অনুধাবন করার চেষ্টা করি।"[১২]

স্বপন বাবু উক্ত প্রবন্ধে আরও বলেন,

"কোঁতের মতে মানুষের মানসিক বিবর্তনও এই একই পথ ধরে এগিয়েছে। প্রথম অবস্থায় দৈবীশক্তিকে, পরবর্তী অবস্থায় নৈব্যর্ক্তিক তত্ত্বকে আশ্রয় করে মানুষ সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে চায়, পরিশেষে সে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্য জীবন ও জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, আদিম অবস্থায় বা পৌরাণিক যুগে মানুষ অগ্নিকে দেবতা ভাবে, দার্শনিক স্তরে বুঝতে পারে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে বলেই সব কিছু দগ্ধ হয়, পজেটিভ স্তরে মানুষ অগ্নিকে রাসায়নিক কার্যবিশেষের ফল বলে ভাবতে শেখে। কোঁতের মতে পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম মেনে হয়।"[১৩]

১৮৫১ সালে রাজনীতি ও সমাজদর্শন শাস্ত্র সম্পর্কিত 'The Positive Polity' গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। বইটির চারটি খণ্ড মোট চার বছর ধরে প্রকাশিত হয়। যেখানে বলা হয়, শুধু বুদ্ধির দ্বারা মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। বাঁচার জন্য মানুষের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি আর ভক্তি থাকা খুবই প্রয়োজন। মোট কথা তিনি বলতে চেয়েছেন, পরোপকাররেই জীবনের চরম সার্থকতা। এই বিশ্বাসকে মাথায় রেখে গড়ে উঠেছে বঙ্কিমের একাধিক সন্ন্যাসী চরিত্র, যারা নিজেকে অর্পিত করেছে পরহিতব্রতে। যেমন 'চন্দ্রশেখর'(১৮৭৫) উপন্যাসে রামানন্দ স্বামী, 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩) উপন্যাসে শ্রী শিবপ্রসাদ শর্মা, কিংবা 'রজনী'(১৮৭৭) উপন্যাসে অমরনাথ ইত্যাদি চরিত্ররা এই কর্মে ব্রতী হয়েছেন। আর আলোচ্য গল্পেও আমরা দেখতে পাবো, সুরেন্দ্র কিংবা সোনারং গ্রামের ডাক্তার এরাও নিজেদের এই একই ব্রতে উৎসর্গ করেছে।

কোঁতের পজিটিভিজম তত্ত্ব সারা বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচিত হয়। এই মতবাদ উনিশ শতকে একাধিক সাহিত্যিকের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, কমলকান্ত ভট্টাচার্য সহ প্রমুখ। কোঁতের মতবাদ আলোচনার জন্য কলকাতায় 'সোসাইটি ফর দ্যা স্টাডি অফ পজিটিভ রিলিজন ইন ইন্ডিয়া' নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ্রামীণ মানুষের মধ্যে কু-সংস্কারকে বদ্ধমূল করার পিছনে থাকে সুবলের মতো কিছু স্বার্থপর, লোভী মানুষের স্বার্থ। যারা টাকার লোভে সুরেন্দ্রর বাবার মতো মানুষকে হত্যা করে আর ভূতে ঘাড় মটকেছে বলে চালিয়ে দেয়। আর এখানেই উঠে আসে কোঁতের পজিটিভিজম তত্ত্ব। গল্পে প্রকৃতপক্ষে সুরেন্দ্র চেয়েছে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে কু-সংস্কারকে দূর করে বিজ্ঞানের আলো দেখাতে। এখনও গ্রাম-বাংলার মানুষ চিকিৎসার পরিবর্তে ওঝার কাছে ছুটে যায়। সুরেন্দ্র ভূত কেনা আসলেই একপ্রকার ছল। সে হয়ত চেয়েছিল গ্রামের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করতে। বৃদ্ধ পবন ভূতের তেল হয় কিনা জানতে চাইলে, সে প্রশ্নের জবাবে সুরেন্দ্র বলেছে—

"দেখই না কী হয়। কত লোকের কত রোগ সারিয়ে দেব।"[১৪]

আসলেই সুরেন্দ্র ছিল শান্তির মতো পেসেন্টের সন্ধানে। যাদের কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়। গ্রামের মানুষ মনে করে, সুরেন্দ্র এত বছর পরে গ্রামে ফিরে এসেছে কেবল গ্রামের মানুষের ওপর বদলা নিতে। এই গ্রামরেই মানুষ তাকে একসময় গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। শুধু তাই নয়, তার মা'র ওলাউঠো হয়ে খেতে না পেয়ে মারা গিয়েছিলো। সেই মৃতদেহ তিনদিন ধরে পড়েছিলো, গ্রামের কেউ সৎকারের ব্যবস্থা করেনি! গ্রামের মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী সুরেন্দ্রর বাবাকে ভূতে ঘাড় মটকেছিল, তাই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল।

গ্রামীণ মানুষের কু-সংস্কারের ফলে আর কিছু স্বার্থ-লোভী মানুষের কারণে শান্তির মতো মেয়েদের ঠিক কতটা অত্যাচারিত হতে হয়, তা লেখক দেখিয়েছেন এই ভাবে—

"মহাদেবের ছেলের নাম সুবল। সে মাটিতে জোড়াসন করে বসে খুব ভাব দিয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে, আর বউটি যেই মাঝে মাঝে বেঁকে দুমড়ে উঠেছে, অমনি সে হাতের ঝাঁটা দিয়ে সপাং সপাং করে পিটোচ্ছে। মহাদেব ওঝা নাকি মারের চোটে রক্ত বার করে দিত। সুবল অতজোরে মারতে না পারলেও তার গালাগালির জোর

আছে। শান্তি একবার বেশি করে হাত-পা ছুঁড়তেই সুবল ওঝা এক হাতে তার চুলের মুঠি চেপে ধরে মারতে মারতে বললো, যা, যা, আবাগির বেটী, শতেক ভাতারী, দূর হ! দূর হ!"[১৫]

যোগেন মাস্টার আর সুরেন্দ্রর কথাবার্তায় উঠে আসে বিজ্ঞান আর কু-সংস্কারের তর্ক। সুরেন্দ্র জানায় সে কখনো আত্মা দেখেনি। তার পরিপ্রেক্ষিতে যোগেন মাস্টার জানায়— "আরে পাগল, এই যে বাতাসে আমরা নিশ্বাস নিই, সে বাতাস আমরা চোখে দেখতে পাই? তার মানে কি বাতাস নেই?"[১৬] এর উত্তরে সুরেন্দ্র জানায়—

"বাতাস চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ধরা যায়।"[১৭]

এর পরিপ্রেক্ষিতে যোগেন মাস্টার বলে—

"বাতাস ধরা যায়? বল কি হে? কেউ কখনো তা পেরেছে? বুকের মধ্যে একটুখানি বাতাস ধরে রাখো, অমনি প্রাণ-পাখি ছটফট করে উঠবে।"[১৮]

এরপর সুরেন্দ্র এক বেলুনওয়ালার কাছ থেকে একটা বেলুন ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে প্রমাণ করে দেয় যে, বাতাস ধরে রাখা সম্ভব। সে বলল—

"এই দ্যাখেন মাস্টারমশাই, বাতাস ধরলাম। আপনি বুঝিয়ে দ্যান তো, আত্মাকে ধরা যায় এইভাবে? আপনি বুঝিয়ে দিলেই আমি মেনে নেবো!"[১৯]

মাস্টার এর ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বলে,

"আত্মাকে ধরবে? ও চিন্তাও করো না বাপ। উনি কখনো ধরা-ছোঁওয়া দেন না। নৈনং ছিদ্রন্তি অং বং চং। তার মানে হলো গে, আত্মাকে কখনো ছ্যাঁদা করা যায় না, তাঁকে আগুনে পড়ানো যায় না, জলে ডোবানো যায় না। আত্মা অজর অমর।"[২০]

গ্রামের লোকের ধারণা অনুযায়ী সুরেন্দ্রর বাবাকে ভূতে ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র তা বিশ্বাস করে না। সুরেন্দ্র যোগেন মাস্টারের উদ্দেশ্যে করে জিজ্ঞাসা করে—

"আমার বাবার ট্যাঁকে সেদিন ধান-বেচা টাকা ছিল। তার এক আধলাও পাওয়া যায়নি। কে নিল সেই টাকা, আত্না না পরমাত্মা? কার বেশি টাকার দরকার? আপনার ঠেঙে জেনে আসবো। গাইয়ের একটা লোকও সেদিন সাক্ষী দেয় নি।"[২১]

সুরেন্দ্রর কথার ঈঙ্গিত বুঝিয়ে দেয় এ কাজ জীবন্ত কোনো প্রেতাত্মার!

এই গল্পেও দেখতে পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি চরিত্র যারা পরহিত কার্যে ব্রতী হয়েছে। যেমন সুরেন্দ্র, যে মূলত গ্রামে এসেছে গ্রামের মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। তাদের অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের পথ দেখাতে। এ ছাড়া সুরেন্দ্র চায়, গ্রামের ছেলেদের শহরে কাজ পাইয়ে দিতে। যাতে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। আর একটি চরিত্রকে পাওয়া যায় যে এই কার্য্যে নিজেকে ব্রতী করেছে। সে হল সোনারং গ্রামের হেলথ সেন্টারের ডাক্তার। তার মাছ ধরার খুব শখ। তবে মাছ খেতে খুব একটা ভালো বাসে না। বেশি মাছ ধরতে পারলে একটা নিজে নিয়ে বাকিগুলো অন্যদের বিলিয়ে দেয়। এইরকমই একদিন নিবারণের ছেলে-মেয়ে গেনু আর পান্তিকে মাছ দিয়েছিল। ডাক্তার তার নিজের ডাক্তারি বিদ্যাকে বিকিয়ে দেয়নি। তার মধ্যে মানবিকতার পরিমাণ বিপুল। সে চেষ্টা করেছে গ্রামের মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার। গ্রামের সকলকেই সে আপনি-আজ্ঞে সম্বোধন করে কথা বলে। নিবারণের বাবা পবনের জন্য বিনা পয়সায় সে ঔষধ দিয়েছিল। শুধু তাই নয় বাড়ি গিয়ে পবনকে দেখে আসার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে পবনকে সুস্থ করার জন্য কিছু ব্যবস্থা করবে বলে জানায়।

তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. স্বনির্বাচিত একশো গল্প. গ্রন্থতীর্থ. ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩. পৃ. ১৮
২. তদেব, পৃ. ২৭
৩. তদেব, পৃ. ২৭
৪.তদেব, পৃ. ১৮

৫.তদেব, পৃ. ১৭
৬.তদেব, পৃ. ২৪
৭.তদেব, পৃ. ২৪
৮.তদেব, পৃ. ২৪
৯.তদেব, পৃ. ২৫
১০ তদেব, পৃ. ১৩
১১. E-Source: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Positivism, Retrieved on 08/03/2023
১২. বসু, স্বপন. বুদ্ধিজীবীর নোটবই. সুধীর চক্রবর্তী(সম্পাদক). নবযুগ প্রকাশনী. পৃ:- ৩৬৬
১৩. বসু, স্বপন. বুদ্ধিজীবীর নোটবই. সুধীর চক্রবর্তী(সম্পাদক). নবযুগ প্রকাশনী. পৃ:- ৩৬৬-৩৬৭
১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল. স্বনির্বাচিত একশো গল্প. গ্রন্থতীর্থ. ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩. পৃ. ১৫
১৫. তদেব, পৃ. ২৩
১৬. তদেব, পৃ. ১৯
১৭. তদেব, পৃ. ১৯
১৮. তদেব, পৃ. ১৯
১৯. তদেব, প. ১৯
২০. তদেব, পৃ. ১৯
২১. তদেব, পৃ. ২০